ঢাকা শহরের যানজট ও যাতায়াত সমস্যা-
সমাধান সম্ভব কি ?

যানজট ও যাতায়াত সমস্যা ঢাকা শহরের মানুষের জীবনকে যে কি দুর্বিষহ যাতনায় ফেলে দিয়েছে তা শহরের প্রতিটি মানুষ জানে। এর ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে অর্থ ও শ্রম ঘন্টার পরিমাপে যে কি বিপুল পরিমান ক্ষতি হচ্ছে তাও সবার জানা। সমস্যার সমাধানে সরকার একের পর এক পরিকল্পনা করে যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রকল্পে কোটি কোটি খরচ করছে, অথচ অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হচ্ছে না। এর সোজা মানে হচ্ছে – (ক) হয় সরকারের পরিকল্পনা ভুল, অথবা (খ) এটি এমন একটি সমস্যা যার কোন সমাধান নেই।

বিজ্ঞানের এই যুগে এই সমস্যার কোন সমাধান নেই একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, সমাধান হচ্ছে না কেন ? এই প্রবন্ধে আমরা প্রধানতঃ এই প্রশ্নের জবাব খুঁজবো। যাতায়াত সমস্যা বা যানজটের কারনে জনগনের কষ্ট বা জাতির ক্ষতি হলেও এ থেকে কিন্তু অনেকের লাভ হয়। যেমন ঃ (ক) যানবাহনের মালিকরা জনগনের কষ্টের সুযোগ নিয়ে ভাড়া বাড়িয়ে তাদের লাভ বাড়িয়ে নিতে পারে। (খ) যানজটের কারনে ফুয়েল (তেল, গ্যাস ইত্যাদি) বেশি ব্যবহার হবার ফলে এই ব্যবসায়ীদের লাভ বেশি হয়। (গ) বিকল্প না পেয়ে মানুষ ধার করেও গাড়ী কিনতে বাধ্য হয়, আর এর ফলে গাড়ির ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাড়ে। আর এই সরকার তো গর্বের সঙ্গেই ঘোষনা করেছে, তারা "ব্যবসায়ী বান্ধব" সরকার। কোন সরকার "ব্যবসায়ী বান্ধব" হলে তারা যে পরিনামে জনগনের কষ্টের কারন হবে এটা তো একেবারে সাধারন জ্ঞানেই বোঝা যায়।

"ব্যবসায়ী বান্ধব" হবার কারনে অথবা নিজেদের ভুলে এই সরকার এমন কিছু কাজ করেছে যা ঢাকা শহরের এই সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে এবং দিনে দিনে আরো বাড়িয়ে চলেছে। সরকারের এই সব কাজের মধ্যে আছে, (ক) ঢাকা শহরের বাইরে বা গ্রামান্চলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা না করে প্রধানতঃ ঢাকা শহরেই বেশী বেশী টাকা খরচ করা, যাতে গ্রামের মানুষ ঢাকামুখী হতে পারে এবং ঢাকার ব্যবসায়ীরা বেশী লাভবান হতে পারে, (খ) শহরে মাস-ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা না করা, (গ) শহরের মানুষ গাড়ি কিনতে বাধ্য হয় এমন অবস্থার সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

যাতায়াত সমস্যার সমাধানে সরকার অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এমন কিছু পরিকল্পনা গ্রহন করেছে যা বাস্তবায়িত হলে শুধুমাত্র কিছু কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীর স্বার্থ রক্ষা হবে, যাতায়াত সমস্যার কোন উন্নতি হবে না। এই সব ব্যবসায়ী এবং সরকারের সৌভাগ্য এই কারনে যে, অর্থাভাবে এগুলির কোনটিই অদূর ভবিষ্যতে শেষ হবে না। এগুলি শেষ হলেই কিন্তু থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়তো, অর্থাৎ এগুলি যে সমস্যার সমাধান করতে পারে না তা প্রমান হয়ে যেত।

ঢাকা শহরের যানজট ও যাতায়াত সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হলে সরকার অত্যন্ত কম খরচে এমন কতগুলি ব্যবস্থা নিতে পারতো যাতে অবস্থার অনেক উন্নতি হতো। মনে হয়, এগুলি সরকারের এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের মাথায় আসে নি, অথবা, এগুলি তেমন খরচ সাপেক্ষ নয় বলে এ ধরনের পরিকল্পনায় তারা কোন আগ্রহ বোধ করে নি। আমরা এই প্রবন্ধে অত্যন্ত কম খরচে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এমন কতকগুলি পদক্ষেপের কথা আলোচনা করবো।

(০১) ঢাকা শহরের জনসংখ্যা কমানো ঃ

ঢাকা শহরকে বাঁচাতে এর জনসংখ্যা অবশ্যই কমাতে হবে। কোন আইন করে নয়, বরং বর্তমানে এই সরকার গ্রামগুলিকে অবহেলা করে শুধুমাত্র ঢাকা শহরে বেশী বেশী টাকা খরচ করে এখানকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার যে নীতি গ্রহন করেছে তা থেকে সরে আসলেই শহরের লোকসংখ্যা কমবে। বর্তমানে ঢাকায় থাকার যে কষ্ট তাতে শখ করে কেউ এখানে থাকে না। বরং চাকুরী, ভালো শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার ভালো সুযোগ এই সব কারনেই থাকে। এর পর যখন বুঝতে পারে এর সঙ্গে তূলনীয় অন্য শহরে বা সুবিধা গ্রামে পাওয়া যাবে না তখন দাঁত কামড়ে পড়ে থাকে। সরকার ও ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্দোগে জিনিসের দাম যখন শুধুমাত্র বাড়তেই থাকে তখন অসৎ পথে উপার্জন করতে বাধ্য হয়। আর এই কাজে তাদের সহায়ক হয় নীতিহীন রাজনীতিকেরা। এই চক্রব্যুহ আমরা বাংলাদেশের জন্মকাল থেকেই দেখে আসছি। তবে এই সরকারের আমলে তা সবচেয়ে বেশী বেড়েছে। অনেকে মনে করেন, শহরে গাড়ীর সংখ্যা কমিয়ে বাস চালু করলেই যাতায়াত সমস্যার সমাধান হবে। তাদের জানা উচিৎ, শহরে গাড়ী একেবারে বন্ধ করে যদি ক্রম বির্ধমান মানুষের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে পরিনামে রাস্তায় বাসের জট লেগে যাবে। তাই ঢাকা শহরের যাতায়াত সমস্যার সমাধান করতে হলে এর জনসংখ্যা অবশ্যই কমাতে হবে।

(০২) জনগনের অত্যাবশ্যক "সুবিধা সুযোগ"গুলি হাঁটার সীমার মধ্যে নিয়ে আসা ঃ

মানুষ ঢাকা শহরে যাতায়াত করে কেন ? অনেক প্রয়োজনে, যেমন, বাচ্চাদেরকে স্কুলে যেতে হয়, প্রতিদিন বাজারে যেতে হয়, মাঝে মাঝে শপিং, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসে বা ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। এগুলি তো নিত্যদিনের ব্যপার। এর বাইরে উপার্জনকারী

ব্যক্তিটিকে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়, আর পড়ুয়া ছাত্রদের যেতে হয় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে । ইচ্ছা করলেও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মক্ষেত্রকে সকলের বাড়ির দোর গোড়ায়, মানে মানুষের হাঁটার দুরত্বে নিয়ে আসা সম্ভব নয় । কিন্তু অন্যগুলি কিন্তু সহজেই আনা সম্ভব ।

সরকার একটি পয়সা খরচ না করে, শুধুমাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কাজটি করতে পারে । কেমন করে ? ঢাকা শহরের বিশেষ এলাকা যেমন, বিশেষ বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত স্থান, কেন্দ্রীয় বানিজ্যক এলাকা (সিবিডি), সংসদ এলাকা ইত্যাদি বাদ দিয়ে সমগ্র ঢাকা শহরকে কতকগুলি এলাকা বা ব্লক- এ ভাগ করা যায় । এই ব্লকগুলির প্রান্ত সীমায় থাকবে রাস্তা। ব্লকের প্রান্তের এই রাস্তাগুলি হবে সর্বনিম্ন দেড় কিলোমেটার থেকে সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটার লম্বা । মানে, ব্লকের ভেতরের এলাকা ততটাই হবে যতটা পথ মানুষ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে পারে । প্রতিটি ব্লকের একটি নাম দেয়া হবে । যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্লকের আনুমানিক লোকসংখ্যা নির্ধারন করবেন । তারপর এই জনসংখ্যার ভিত্তিতে ব্লকে কতটি স্কুল, বাজার, বিভিন্ন ধরনের ডাক্তার থাকবেন তা নির্ধারন করে দেবেন । তবে মনোপলি এড়াবার জন্য যে কোন আইটেম (বা সুবিধা) এর সংখ্যা হবে সর্বনিম্ন দুই ।

প্রতিটি ব্লকে যে যে সুবিধা থাকবে তা হলো ঃ (১) কাঁচা বাজার, (২) মুদী দোকান (গ্রোসারী), (৩) বাচ্চাদের স্কুল, (৪) সম্ভব ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুল, (৫) আবাসিক হোটেল, (৬,৭) কর্মজীবি পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, (৮,৯) ছাত্র ও ছাত্রীদের হোস্টেল, (১০) কমিউনিটি সেন্টার, (১১- ১৪), সাধারন রোগ, শিশু রোগ, ধাত্রী- সংক্রান্ত ও দাঁতের ডাক্তার, (১৫- ১৬) বৈদ্যুতিক ও সাধারন যন্ত্রপাতি সারাইয়ের দোকান, ইত্যাদি । ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল থাকার যৌক্তিকতা হলো, ধরা যাক, কোন ব্লকে একটি পরিবার আছে, যাদের গ্রামে বসবাসকারী কোন আত্মীয় চান, এদের তত্বাবধানে তাদের কোন সন্তান পড়াশোনা করুক । এ ধরনের হোস্টেল প্রতি ব্লকে রাখা হলে শুধুমাত্র সন্তানের ভাল পড়াশোনা নিশ্চিত করার জন্য অনেক পরিবারের আর কষ্ট করে শহরে থাকার প্রয়োজন হবে না ।

বলা হয়, জানি মানুষের যেসব সুবিধা প্রয়োজন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেখানেই তা গড়ে ওঠে “মানুষের যেসব সুবিধা প্রয়োজন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেখানেই তা গড়ে ওঠে” । সত্য হলো, বাংলা দেশের ক্ষেত্রে এ তথ্য সত্য নয় । বাংলাদেশে এগুলি গড়ে ওঠে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে । যেমন, ধানমন্ডিতে বড় বড় বাড়ী পাওয়া যায় বলে এখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্কুল গড়ে উঠেছে । বড় প্রাইভেট হাসপাতালগুলি সুসজ্জিত স্থান দেয় বলে ডাক্তারেরা সেখানে বসে ইত্যাদি । তাই আমরা মানুষের হাঁটার সামর্থের উপর ভিত্তি করে এগুলির পুনর্বিন্যাসের কথা বলছি ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে সব ব্লকে এগুলি নেই সেখানে এগুলো গড়ে উঠবে কি ভাবে ? আবার হয়তো দেখা যাবে,অনেক ব্লকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাঁচটি বাজার, দশ বারো জন ডাক্তার, ১২/১৩ টি স্কুল আছে । সেগুলোই বা কি করে বন্ধ করা যাবে ? উত্তর হচ্ছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্লকের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে এগুলির সংখ্যা নির্ধারন করে দেবেন । এই সংখ্যার মধ্যে যারা পড়বেন তারা সরকারের নির্ধারিত হারে কর দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন । এই সংখ্যার অতিরিক্ত যারা থাকবেন তাদেরকে দ্বিগুন হারে কর দিতে হবে । একটি যৌক্তিক নিয়মে “অতিরিক্ত”দের চিহ্নিত করা হবে । যেমন, স্কুলের ক্ষেত্রে বেশী ভৌতিক সুবিধা, ডাক্তারের ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রী ইত্যাদি অগ্রাধিকার পাবে । আসলে এমনটি করা হলে কর সুবিধা লাভ করার জন্য বাড়ির মালিক বা পেশাজীবিরা নিজেরাই যথাস্থানে এসব সুবিধা গড়ে তুলবে বা নিজেরা স্থানান্তরিত হবে । সরকারকে কিছুই খরচ করতে হবে না । শুধুমাত্র এটুকু করা হলে এখন মানুষ এই কয়টি প্রয়োজনে যে এদিক সেদিক চলাচল করে বা এই উদ্দেশ্যে যানবাহন (গাড়ি সহ) ব্যবহার করে তার আর প্রয়োজন হবে না । গাড়ি থাকলেও অনেকেই তা ব্যবহার করবে না । রাস্তায় প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা কমে গেলে বড় বাস সহজেই চলাচল করতে পারবে । তাই শহরে প্রাইভেট গাড়ীর সংখ্যা বা ব্যবহার কমাতে হলে জনগনের অত্যাবশ্যক “সুবিধা সুযোগ”গুলিকে তাদের হাঁটার সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে ।

(০৩) পাবলিক বাসের রুট জনগনের স্বার্থে পূনর্বিন্যাস করা (ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নয়)ঃ

আমাদের বর্তমান বাস ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়োজনে, জনগনের স্বার্থে নয় । ব্যবসায়ীরা পছন্দ করে লম্বা এবং সব স্থানে থামবে এমন রুট। এর ফলে প্রায় সব সময় তাদের বাস অতিরিক্ত যাত্রীতে বোঝাই থাকবে । আর এই ধরনের বাসেই জনগনের কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশী । আবার শুধুমাত্র যেসব রুটে যাত্রী বেশী হয় সেসব রুটেই বাস চালানো নয়, অন্যগুলিতে চালানো হয় না । তার মধ্যে চালু রুটগুলিতে শুধুমাত্র সরকারের কৃপাধন্য লোকেরাই বাস চালাতে পারে।

অথচ জনস্বার্থে বাস চালাতে হলে সমগ্র শহরকে এই রুটের মধ্যে আনতে হবে । এই উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ এলাকার মধ্যে বাস চলাচলের পরিবর্তে সমগ্র শহরে উত্তর- দক্ষিন ও পুর্ব- পশ্চিম বরাবর কতকগুলি প্রায় সমান্তরাল রুট চালু করতে হবে । এই সব রুটে যাত্রীদের প্রকার ও সংখ্যা ভেদে বড়, মাঝারী এবং শিতাতপ নিয়িন্ত্রিত বাস চালু করতে হবে । বিভিন্ন বাস মালিকদের সাথে এমন চুকতি থাকবে যে একটি কম চালু রুটে বাস চালালে তবেই তাকে একটি বেশী চালু রুটে বাস চালাতে দেয়া হবে । স্বাভাবিক নিয়মে বাসগুলি অফিসের সময় ঘন ঘন চলবে, আর অন্য সময় চলবে একটু বেশী সময় পর পর ।

পাবলিক যানবাহন থাকবে প্রধানত তিন ধরনের । যেমন ঃ (০১) কানেক্টর বাস - লাগেজ ক্যারিয়ার সহ বড় বড় বাস, যা বিভিন্ন পোর্ট ও টার্মিনালের (নৌ, বিমান, রেল বা বাস স্টেশন) মধ্যে চলাচল করবে । (০২) সিটি বাস - শহরের উত্তর- দক্ষিন ও পুর্ব- পশ্চিম বরাবর রাস্তায় চলাচল করবে । এগুলি নির্দিষ্ট রিটে স্বল্প দুরত্বে থেমে থেমে চলবে । (০৩) শাটল বাস - এগুলি জনবসতিপূর্ন এলাকা থেকে সরাসরি বানিজ্যিক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলাচল করবে এবং সময় রাখার স্বার্থে খুব কম স্থানেই থামবে । এদের রুটও তেমন দীর্ঘ হবে না । (০৪) লাগেজ ক্যারিইয়ার বাস - লাগেজ বহনের কোরিয়ার ব্যবসায়ীরা এই যানবাহনগুলি ব্যবহার করবে ।

সকল পোর্ট ও টার্মিনালে থাকবে একাধিক লাগেজ বুকিং কোরিয়ার সার্ভিস । বাইরে থেকে যারা ঢাকায় আসেন তাদের সঙ্গে যে মালপত্র থাকে (দূর পাল্লার লঞ্চ বা বাসে এগুলি বহনের ব্যবস্থা থাকে) সিটি বাসে তা বহন করা যায় না বলে যাত্রীগন অন্য যানবাহন (ট্যাক্সি, সিএনজি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে বাধ্য হয় । লাগেজ বুকিং কোরিয়ার সার্ভিসগুলির কাজ হবে সর্বোচ্চ, ধরা যাক, ২' X২'X ৩.৫ ফুট আয়তনের লাগেজ গ্রহন করা এবং জরুরী (৬ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারী) বা সাধারন (১২ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারী) ভিত্তিতে প্রতিটি ব্লকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা ।

উপরে যেসব রুটের কথা বলা হলো, সেখানে ঐ চার ধরনের বাস ছাড়া আর কোন বাস চলাচল করবে না । সরু রাস্তাগুলিতে চলবে বর্তমানে “লেগুনা” হিসেবে পরিচিত যানগুলি । তবে এগুলির ডিজাইনে পরিবর্তন আনতে হবে । যাত্রীরা ঢুকবে ড্রাইভারের পাশ দিয়ে, আর ড্রাইভার একাই সব নিয়ন্ত্রন করবে । এত ছোট বাহনে দুজন লোক রাখা হলে খরচ ও যাত্রীদের ভাড়া দুইই বেড়ে যায় । এর বাইরে ভাড়ায় চলাচলের জন্য ট্যাক্সী আর অটো রিকশা তো থাকবে, যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডে পাওয়া যাবে ।

মানুষ তাদের কর্মস্থল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাসে যাতায়াত করতে আগ্রহী হবে তখনই যখন তারা জানবে, একটি নির্দিষ্ট স্থানে গেলেই তারা অফিস সময়ে একটু পর পর বাস পাবে । বিভিন্ন এলাকার মধ্যে শাটল বাস ছাড়া এটি নিশ্চিত করা সম্ভব নয় । আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ আর জনগনের স্বার্থ আলাদা জিনিস ।

(০৪) যান চলাচলের ক্ষেত্রে শহরকে কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা ঃ

আমরা জানি, বড় বড় জনসভা করার সময় সমগ্র মাঠকে একেবারে খোলা না রেখে বাঁশ দিয়ে ছোট ছোট এলাকা বা কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা হয় । এর কারন, কোন কারনে সব মানুষের ভিড় যাতে এক জায়গায় না পড়ে । এভাবে কম্পার্টমেন্টালাইজেশন না করা হলে অনেক কিছুই ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না । বাংলাদেশে যত গাড়ি আছে তার শতকরা এক ভাগ যদি কোন কারনে এক সময়ে ঢাকা শহরে আসে তাহলে ঢাকা শহরের অবস্থা কেমন হবে কল্পনা করা যায় ? অথবা ঢাকা শহরে যত গাড়ি আছে, ধরা যাক, তার অর্ধেকও যদি কোন কারনে ধানমন্ডি এলাকায় আসে তাহলে কেমন অবস্থা হবে ?

এই ধরনের সমস্যা এড়ানোর জন্যই প্রয়োজন ঢাকা শহরকে কম্পার্টমেন্টালাইজড করা । এটা যে ভাবে করা যায় তা হলো, বর্তমানে যে এলাকা নিয়ে বৃহত্তর ঢাকার মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে তাকে প্রধানতঃ পাঁচটি অংশে ভাগ করা হবে । যেমন ঃ (০১) কেন্দ্রীয় ঢাকা, (০২) ঢাকা উত্তর, (০৩) ঢাকা দক্ষিন, (০৩) ঢাকা পূর্ব এবং (০৫) ঢাকা পশ্চিম । এটি করার জন্য কোন সীমানা চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই । শুধুমাত্র ঘোষনা করলেই হবে যে অমুক রাস্তার অমুক পাশ থেকে অমুখ রাস্তা পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় ঢাকা ইত্যাদি ।

কেন্দ্রীয় ঢাকা হবে যথা সম্ভব ছোট – যার পরিসীমা হবে (ধরা যাক) দক্ষিনে বুড়িগঙ্গা নদী, পশ্চিমে তুরাগ নদী, উত্তরে উত্তরা মডেল টাউন এবং হজরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাঝামাঝি অবস্থানে তুরাগ নদী থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ রোড পর্য্যন্ত

আনুভূমিক লাইন এবং পূর্বে ঢাকা ময়মনসিংহ রোড বরাবর বিমান বন্দর রেল ষ্টেশন থেকে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতূ পর্য্যন্ত । তবে পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, টেলিভিশন ভবন এবং আনসার সদর দপ্তর এর অন্তর্ভুক্ত হবে ।

কেন্দ্রীয় ঢাকা হবে ফেডারেল রাজধানীর মতন, যেখানে শুধুমাত্র বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ন, বিভিন্ন বিষয়ে সর্বোচ্চ মানের প্রতিষ্ঠান এবং দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের নীতি নির্ধারক এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাজ করা এবং বসবাসের স্থান থাকবে। এই এলাকার আইন, ভূমি ব্যবহার, যাতায়াত ইত্যাদি হবে একেবারে আলাদা রকমের । বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ন ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বলে গুলশান বনানী এই এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না ।

এই এলাকার প্রধান বিশেষত্ব হবে এর আইন । কেন্দ্রীয় ঢাকায় যে কোন অপরাধের জন্য শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন । কোন অপরাধের জন্য সাধারন ভাবে যে শাস্তি দেয়া হয় একই অপরাধ কেন্দ্রীয় ঢাকা এলাকার মধ্যে করা হলে শাস্তি হবে তার দ্বিগুন । কোন কোন অপরাধের (যেমন, চালকের দোষে সড়ক দূর্ঘটনা) শাস্তি হবে এই এলাকা থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বহিষ্কার ।

কেন্দ্রীয় ঢাকায় বাইরে থেকে আসা সকল রাস্তা হবে নিয়ন্ত্রিত । এই এলাকার বিদ্যুত, পানি, গ্যাস, পয়ঃনিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই থাকবে ঢাকার অন্য এলাকা থেকে আলাদা এবং স্ব- নিয়ন্ত্রিত । কেন্দ্রীয় ঢাকার সকল রাস্তা তার আভ্যন্তরীন রাস্তা হিসেবে বিবেচিত হবে । বাইরে থেকে আসা ভারী যানবাহন অন্য কোথাও যাবার জন্য এই এলাকা অতিক্রম করবে না । বর্তমানে যে সব যানবাহনকে তা করতে হয় তাদের জন্য ক্রমান্বয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে । নির্মীয়মান এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটিকে কেন্দ্রীয় ঢাকার জন্য ‘বাই- পাস’ রোড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে । কেন্দ্রীয় ঢাকার বাইরে থেকে আসা বাসগুলিকে গাবতলী, বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতূ এবং বিমান বন্দর এলাকায় থামতে হবে । এই কয়টি পয়েন্ট এবং বিমানবন্দর, নৌবন্দর সহ সকল গুরুত্বপূর্ন স্থানে যাতায়াত্ করবে সিটি বাস, যার কেন্দ্রীয় টারমিনাল হবে বর্তমান মহাখালী বাস টারমিনাল ।

কেন্দ্রীয় ঢাকার সমস্ত জমির মালিক হবে সরকার । তবে এটি একটু একটু করে প্রয়োগ করতে হবে । সরকার কেন্দ্রীয় ঢাকার জমির দাম বেঁধে দেবে । এই এলাকার কেউ জমি বিক্রী করতে চাইবে তাদেরকে কেবলমাত্র সরকারের কাছেই তা বিক্রী করতে হবে । মৃত ব্যক্তির জমি পরবর্তীতে সরকারের মালিকানায় যাবে, তবে তার উত্তরাধিকারী সরকার নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরন পাবে । যে সব জমি বর্তমানে ৯৯ বৎসরের জন্য লীজ দেয়া আছে সেগুলিও শুধুমাত্র সরকারের কাছেই হস্তান্তর করা যাবে ।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় যেসব জমি বা বাড়ী সরকারের হাতে আসবে সরকার সেগুলি ঐ এলাকার বা রাজধানী ঢাকার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ন ভাবে ব্যবহার করা হবে । প্রয়োজন হলে ভেঙ্গে নতুন করে নির্মান করা হবে, অথবা ক্রান্তিকালীন সময়ে জনগনের কাছে লীজ দে্যা হবে ।

এই এলাকায় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠান, যারা দেশের অভ্যন্তরের এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করবে । কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধীনে থাকা যে সব প্রতিষ্ঠান দেশের অভ্যন্তরে উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব বা পশ্চিম অনচলের সঙ্গে কাজ করবে সেসব প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমান্বয়ে যথাক্রমে ঢাকা- উত্তর, ঢাকা- দক্ষিন, ঢাকা- পূর্ব বা ঢাকা- পশ্চিম এলাকায় স্থানান্তরিত বা স্থাপন করা হবে । এর ফলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সব মানুষ ঐসব অফিসে আসবেন তাদেরকে কেন্দ্রীয় ঢাকায় আসতে হবে না ।

কেন্দ্রীয় ঢাকায় থাকবে সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের গবেষনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান । যেমন, সাধারন শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । এখানে শুধুমাত্র মাষ্টার্স, পিএইচডি ও গবেষনার কাজ চলবে। স্নাতক পর্য্যায়ের শিক্ষা চলে যাবে উপরে উল্লিখিত চারটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলিতে । প্রকৌশল, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও একই ভাবে বিন্যস্ত করা হবে । প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র উচ্চপর্য্যায়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য থাকবে আবাসিক ভবন । কর্মজীবি ও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য থাকবে হোস্টেল এবং নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের জন্য থাকবে কেবলমাত্র একক (অর্থাৎ পরিবারবিহীন) ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা ।

এই এলাকায় থাকবে সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের সংস্কৃতি ও গবেষনার প্রতিষ্ঠান । এজন্য থাকবে লাইব্রেরী, অডিটোরিয়াম সহ সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষনা করার জন্য বড় বড় কমপ্লেক্স । তার প্রত্যেকটিতে থাকবে পরিবার- সহ, একক মহিলা এবং পুরুষের, বিদেশী অতিথিদের এবং

দেশের অভ্যন্তর থেকে আসা সাধারন লোকের সামইয়িক ভাবে থাকার ব্যবস্থা । এই সব কমপ্লেক্স- এ নামকরণ করা হবে দেশের বুখ্যাত মণীষীদের নামে করা । এখানে সারা বৎসর ধরেই চলবে নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা, যেখানে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষের আসার এবং সাময়িক ভাবে থাকার ব্যবস্থা থাকবে । বাংলাদেশের সংস্কৃতির সহায়ক নয় বলে এই এলাকায় কোন মদের দোকান, নাইট ক্লাব ইত্যাদি থাকবে না । সেই সাথে পরিবেশ দূষনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, বৃদ্ধনিবাস, এতিমখানা ইত্যাদিও থাকবে না । বর্তমানে এখানে থাকা এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমান্বয়ে অন্য এলাকায় সরিয়ে নিতে হবে ।

স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েকটি সরকারের বুদ্ধি বা নীতিহীন কাজ কর্ম দেখে উপরে বর্নিত রূপরেখাটি আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে । তবে কয়েকটি সরকারের ব্যর্থতা দেখেই ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে অর্জিত বাংলাদেশটি সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত হবে না । ভালো, বুদ্ধিমান এবং নীতিবান সরকার এদেশে একদিন অবশ্যই আসবে, যারা গুটি কয়েক মানুষের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে এই দেশের সন্মান, এই দেশের সকল মানুষের স্বার্থ, শহীদদের স্বপ্নকে বেশী গুরুত্ব দেবে । তাদের অনুসরন করার আমাদের উচিৎ, কাল্পনিক হলেও সোনালী চিত্র এঁকে রাখা ।

(০৫) শহরে ট্যাক্সীর সংখ্যা বাড়ানো ঃ

প্রাইভেট গাড়ীর একেবারে কাছের বিকল্প হতে পারে ট্যাক্সী, যা একজনকে তার বাড়ির দরজা থেকে অফিসের দরজায় নামিয়ে দেয় । তাই ট্যাক্সীর সংখ্যা বাড়লে এবং ভাড়া কম হলে অনেকে গাড়ি ব্যবহার করবে না । অনেক টাকা ব্যয়ে বিদেশ থেকে গাড়ি না এনেও একটি উপায়ে শহরে ট্যাক্সীর সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব । সমাধানটি আমার প্রস্তাবিত । এটির নাম "দ্বি- ব্যবহারিক যান" । এটি হচ্ছে সরকারের একটি নিয়ম যা এই রকম । ইচ্ছুক প্রাইভেট গাড়ির মালিকরা তাদের গাড়ি শুধুমাত্র এক বেলার জন্য (সকাল থেকে দুপুর, অথবা দুপুর থেকে রাত) ট্যাক্সী হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে । এই কাজের জন্য গাড়ীগুলির যা যা লাগবে তা হলো, (ক) সরকারী ঘোষনা (বা নিয়ম), (খ) এই গাড়ির জন্য বিশেষ লাইসেন্স নম্বর, (গ) ভাড়ার মিটার এবং (ঘ) নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহারের জন্য ট্যাক্সীর পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন । বিভিন্ন মালিক তাদের গাড়ী "দ্বি- ব্যবহারিক যান" হিসেবে ব্যবহারের জন্য আবেদন করলে, কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ব্লক থেকে কম পুরানো (নতুন রেজিস্ট্রেসন) গাড়িকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অনুমতি দেবে ।

এতে গাড়ি আমদানী বাবদে বা অন্য খাতে সরকারের কোন টাকা খরচ হবে না। দ্বি- ব্যবহারিক যানের সুবিধাগুলি হলো - এর ফলে (ক) রাস্তায় আমরা বেশী সংখ্যক ট্যাক্সী দেখতে পাবো, (খ) গাড়ীর সংখ্যা কিছু কমবে, (গ) ট্যাক্সীগুলির ভৌত অবস্থা অনেক ভালো থাকবে, (ঘ) এগুলির মালিক এবং ড্রাইভার কিছুটা আর্থিক সুবিধা লাভ করবে, (ঙ) প্রতিটি এলাকায় ট্যাক্সী পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ইত্যাদি। আর অসুবিধার মধ্যে আছে, মালিকের নির্বাহী খরচ একটু বাড়বে, এবং গাড়ির আয়ু একটু কমবে । কিন্তু তারা যেহেতু বাড়তি টাকা আয় করবে তাই এটি তেমন সমস্যা হবে না ।

(০৬) রিপ্লেসমেন্ট পদ্ধতিতে পুরানো গাড়ি বাতিল করার ব্যবস্থা করা ঃ

পৃথিবীর অনেক শহরেই গাড়ীর সংখ্যা তেমন না বাড়ার কারন, তারা পুরানো গাড়ী একেবারে বাতিল করে ভাগাড়ে ফেলে দেয় । আমাদের দেশে ভালো মেকানিক পাওয়া যায় বলে পুরানো গাড়ী বছরের পর বছর চালু রাখা যায় । এ বাস্তবতায় পুরানো গাড়ীর সংখ্যা কমানোর জন্য আমার প্রস্তাব – "রি- প্লেসমেন্ট বা রিপ্লেসিং" পদ্ধতি ।

এই পদ্ধতিতে গাড়ির ব্যবসায়ীগন শুধুমাত্র সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত মালিকদের কাছে গাড়ী বিক্রীই করতে পারবে । সরকারের অনুমতির ভিত্তি হবে, কোন মালিক (ধরা যাক), দুই বৎসর ব্যবহারের পর তার পুরানো গাড়ীটির কাগজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে একটি নতুন গাড়ী ক্রয়ের জন্য অনুমতি চাইবে । কর্তৃপক্ষ পুরানো গাড়ীটি যন্ত্রাংশ বা ধাতূ হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে তাকে একটি নতুন গাড়ী ক্রয়ের অনুমতি দেবে ।

এ পদ্ধতি চালু হলে পুরানো মালিকরা তাদের গাড়ির বদলে নতুন গাড়ী কিনতে পারবে, তাদের পুরানো গাড়িটি আর থাকবে না । আবার, যারা নতুন গাড়ী কিনতে ইচ্ছুক তাদেরকে একটি পুরানো গাড়ী কিনে দুই বৎসর অপেক্ষা করতে হবে । এর পুরানো গাড়ীগুলি রাস্তা থেকে ক্রমে ক্রমে উধাও হয়ে যাবে । রিপ্লেসিং পদ্ধতি চালু হলে গাড়ী বিক্রয়ের হার একটু কমবে, কিন্তু দেশে পুরানো গাড়ীর সংখ্যা অনেক কমে যাবে ।

উপসংহার ঃ

যাতায়াত বিশেষজ্ঞরা ঢাকা শহরে বাসের জন্য আলাদা রাস্তা, রাস্তার সংযুক্তিতে ফ্লাইওভার, উড়াল পথ (এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে), মেট্রো রেল এসব নির্মানের কথা বলে থাকেন । সরু রাস্তা নিয়ে গড়ে ওঠা ঢাকা শহরে এগুলির কোনটিই বাস্তবসম্মত নয় । তার পরও এসব প্রকল্প গ্রহনের একটি কারন হতে পারে, এ ধরনের কাজে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় তা থেকে সুবিধা লাভ করা। এর সঙ্গে তুলনায় এই প্রবন্ধে যে সব প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার জন্য খরচ একেবারে নগন্য । সকলের সুবিধার জন্য প্রস্তাবগুলির শিরোনাম আরো একবার উল্লেখ করছি ।

(০১) ঢাকা শহরের জনসংখ্যা কমানো (গ্রাম ও ছোট শহরে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়ালেই ঢাকার জনসংখ্যা কমবে)
(০২) জনগনের অত্যাবশ্যক ‘‘সুবিধা সুযোগ’’গুলি হাঁটার সীমার মধ্যে নিয়ে আসা (নিয়ম প্রনয়ন ছাড়া কোন খরচ নেই)
(০৩) পাবলিক বাসের রুট জনগনের স্বার্থে পূনর্বিন্যাস করা (ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নয়) (নিয়ম প্রনয়ন ছাড়া কোন খরচ নেই)
(০৪) যান চলাচলের ক্ষেত্রে শহরকে কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা (নিয়ম প্রনয়ন ছাড়া কোন খরচ নেই)
(০৫) শহরে ট্যাক্সীর সংখ্যা বাড়ানো (দ্বি- ব্যবহারিক যান প্রবর্তনের মাধ্যমে করা হলে নিয়ম প্রনয়ন ছাড়া কোন খরচ নেই)
(০৬) রিপ্লেসমেন্ট পদ্ধতিতে পুরানো গাড়ি বাতিল করার ব্যবস্থা করা (শুধুমাত্র নিয়ম প্রনয়ন ছাড়া কোন খরচ নেই) ।

এর বাইরে জনগনের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলেই শহরে লাগেজ ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে । আমাদের মনে হয়, এগুলি করা হলে শহরের যাতায়াত সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে । আর ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত একটি দেশের রাজধানীর যে ‘‘সোনালী চিত্র’’ আমরা উপরে এঁকেছি তার বাস্তবায়ন ‘‘ব্যবসায়ী- বান্ধব’’ সরকারের কাছে আশা করা অনুচিত । তেজগাঁও এলাকায় মানুষ ফুটপাথের উপর ঘর বানিয়ে ব্যবসা করছে, ঘর সংসার করছে । জনগনের হাঁটার পথ যারা আপন স্বার্থে বিক্রী করে দেয় তাদের কাছে কোন কি চাওয়া উচিত, আর কি না চাওয়া উচিত তাই বুঝতে পারছি না । উপরে যে সব প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার কোনটি থেকেই কারো আর্থিক লাভ হবার সম্ভাবনা নেই । তাই আমরা ধরে নিতে পারি, এগুলো সরকারের মনঃপুত হবে না । তার মানে দাড়াচ্ছে, আগামী দিনগুলিতেও আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ সাপেক্ষ বড় বড় প্রকল্পের কথা শুনব, টাকা নয় ছয় হবার খবর পাব, আর যাতায়াত সমস্যার কারনে দুঃর্বিসহ জীবন যাপন করবো ।

অধ্যাপক বিজন বিহারী শর্মা, স্থাপত্য বিভাগ, আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।